হাসিনা আর্মি সম্পর্কে আসলে কী বলেছিলেন?

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

ক্যালাহান থেকে কুলদীপ নায়ার–২

বাংলাদেশ আর্মির একাংশের এবং তাদের ক্ষমতালোভী একশ্রেণীর জেনারেলের কার্যকলাপের জন্য যদি তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট না হতো, তাহলে আজ বিশ্বে শুধু দক্ষ পেশাদার বাহিনী হিসেবে নয়, একটি লিবারেশন আর্মি হিসেবে এই তরুণ সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা পেতো। গত সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোট ভোটারদের ভয় পাওয়ানো এবং আওয়ামী লীগের সমর্থক, নির্বাচন প্রার্থী ও কর্মীদের উপর নির্যাতন চালানোর কাজে এই বাহিনীর একাংশকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের মনেও তাদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। সেনাপ্রধানদের উচিত, প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নয়, সেনাবাহিনীর আচরণ, মনোভাব ও কার্যক্রম দ্বারা কিভাবে তাদের নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ ভূমিকা সম্পর্কে দেশবাসীর মনে আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা যায় সে জন্য চেষ্টিত হওয়া। আমি নিজেও বিদেশে বসে এই সেনাবাহিনীর জন্য গর্বিত হতে চাই। চাই বিদেশেও তাদের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে উঠুক

সিঙ্গাপুরে কানের চিকিৎসা অর্ধসমাপ্ত রেখে শেখ হাসিনা দেশে ফিরে এসেছেন এবং ৩ অক্টোবরের মহাসমাবেশে যোগ দিয়েছেন। ঢাকার এই মহাসমাবেশে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। দেশময় গণগ্রেফতার, গণনির্যাতন এবং হাজার হাজার লোকের জন্য বাইরে থেকে ঢাকা আগমনে বাধা সৃষ্টি করেও খালেদা-নিজামী সরকার এই মহাসমাবেশ অনুষ্ঠান ভণ্ডুল করতে পারেননি। গত ২১ আগস্ট থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে যা ঘটেছে, তাতে ক্ষমতাসীন চক্রের তিনটি বড় নৈতিক পরাজয় হয়েছে। আগেই বলে রাখি এই বিশ্লেষণটি আমার।

প্রথম পরাজয়, আট-একুশের ঘটনায় এমন কমান্ডো কায়দায় গ্রেনেড হামলা চালিয়েও শেখ হাসিনাকে হত্যা করা যায়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক হত্যাযজ্ঞের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে নব্য হানাদারগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ ব্যর্থতা বরণ করতে হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের আমি এবার বাহবা দেব। তারা তাদের নেত্রীর চারপাশে নিরাপত্তার লৌহ বেষ্টনী তৈরি করেছিলেন এবং অনেকে জীবন বলি দিয়ে নেত্রীর জীবন রক্ষা করেছেন। লখিন্দরের জন্য নিরাপত্তার লৌহ বেষ্টনী তৈরি করেও মনসার ছোবল থেকে তাকে রক্ষা করতে পারেননি স্ত্রী বেহুলা। কিন্তু এবারে মনসা পরাজিত হয়েছে। আইভি রহমানসহ অনেকের শরীরেই সে মরণ ছোবল হানতে সক্ষম হয়েছে। হাসিনাকে ছুঁতে পারেনি।

মহাশক্তিশালী এবং জোটবদ্ধ চক্রান্তকারীদের দ্বিতীয় পরাজয়, মিডিয়ার একটি প্রভাবশালী অংশকে কব্জা করে এবং ক্ষমতাসীনদের অনুগৃহীত 'ডার্টি ডজন' নামে পরিচিত সম্পাদক ও কলামিস্টদের মাধ্যমে নানা রকম অপপ্রচার চালিয়েও দেশের মানুষকে কিংবা বিদেশের কূটনীতিক ও রাষ্ট্রনায়কদেরও বিভ্রান্ত করা যায়নি। ভারতীয় কলামিস্ট কুলদীপ নায়ারকে হায়ার করে এনেও লাভ হয়নি। তিনি এখন ঢাকার 'নিরপেক্ষ' সম্পাদকদের বন্ধু সাজলে কি হবে? তিনি আসলে কাদের বন্ধু এবং কাদের হয়ে তিনি হাসিনাকে বিব্রত করা ও বিতর্কে জড়ানোর জন্য ঢাকায় তশরিফ এনেছিলেন তাও এতদিনে জানাজানি হতে বাকি নেই। স্বাধীন বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় তার প্রায় নিয়মিত কলামিস্ট হিসেবে আবির্ভাব 'ডেইলি স্টারের' পিঠে চড়ে। পাকিস্তানের 'ডন' আর বাংলাদেশের স্টারে তিনি তার মনের মাধুরী মিশিয়ে একই সুরে গান গেয়ে থাকেন। ১৯৫৪ সালে চক্রান্তকারীরা আমেরিকা থেকে সাংবাদিক ক্যালাহানকে হায়ার করে এনে শেরে বাংলা ফজলুল হকের কাঁধে দেশদ্রোহিতার (করটর্ধমর) অপবাদ চাপিয়ে তাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করতে পেরেছিল। ২০০৪ সালে একই উদ্দেশ্যে চক্রান্তকারীরা দিল্লি থেকে কুলদীপ নায়ারকে হায়ার করে এনে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। এটা তাদের একটা বড় পরাজয়।

আট-একুশের ব্যর্থতার পর চক্রান্তকারীরা কখনও স্পষ্ট এবং কখনও অস্পষ্টভাবে একটি প্রচার চালাতে শুরু করেছিল। এই প্রচারের ইঙ্গিত ছিল গ্রেনেডের স্প্লিন্টার্সে আহত আওয়ামী লীগ নেতারা মানসিকভাবেও জখম হয়েছেন। গ্রেডেনের ভয়ে তারা আর আন্দোলনে নামতে সাহস পাবেন না। অন্যদিকে শেখ হাসিনাও কোন একটা ছুঁতো ধরে বিদেশে পাড়ি জমাবেন। সহসা আর দেশে ফিরবেন না। হাসিনা যখন গ্রেনেডের শব্দে তার কানের ক্ষতিগ্রস্ত ঝিল্লির চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে গেলেন, তখন জোট সরকারের অনেক নেতানেত্রীর মুখের মুচকি হাসিটি গোপন ছিল না। কিন্তু শেখ হাসিনা যথাসময়ে দেশে ফিরে এসেছেন। ৩ অক্টোবরের মহাসমাবেশে ভাষণ দিয়েছেন। গ্রেনেড হামলায় সদ্য পত্নীবিয়োগে কাতর অসুস্থ নেতা জিল্লুর রহমান কোন ভয়ভীতির পরোয়া না করে মহাসমাবেশে এসে সভাপতিত্ব করেছেন। দেশের মানুষও গ্রেনেডের হামলায় ভয় পায়নি। ৩ অক্টোবরের গণসমাবেশ গণপ্লাবনে পরিণত হয়েছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষের ভয় ভাঙছে। এটাই ক্ষমতাসীন চক্রের সবচাইতে বড় পরাজয়। এই পরাজয়ই তাদের চূড়ান্ত পতনের সূচনা ঘটাবে।

এবার আসি সেনাবাহিনী সম্পর্কে শেখ হাসিনার কথিত বক্তব্যের প্রসঙ্গে। কুলদীপ নায়ারের লেখায় হাসিনা আট-একুশের ঘটনার জন্য সেনাবাহিনীকে দায়ী করেছেন, এই কথাটি বলা হতে না হতেই তা লুফে নেয় ক্ষমতাসীনদের বশংবদ সংবাদ সংস্থা বাসস এবং তাদের খয়ের খাঁ কলামিস্টরা। সবচাইতে বিস্ময়কর হলো তড়িঘড়ি সেনা সদর দফতর (আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ বিভাগ) কর্তৃক হাসিনার বক্তব্যের প্রতিবাদ করা এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর নিন্দাজ্ঞাপন। এ কাজটি কোন দেশের সেনাবাহিনী এমনভাবে করতে পারে না। এবার বাংলাদেশের সেনা সদর দফতর কেন করেছে সেই রহস্যও একদিন উঘাটিত হবে। সেনা সদর দফতরের প্রেস বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে সেনাবাহিনীকে তাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব) এম মোস্তাফিজুর রহমান বি.বি.।

ঢাকার সংবাদপত্রে '২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা : যে প্রশ্নের জবাব প্রয়োজন' শীর্ষক নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, "সেনাবাহিনী প্রতিবাদ করে না, পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দেয় মাত্র।" আট-একুশের ঘটনা সম্পর্কে সেনা সদর দফতর অবশ্যই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে একটি বিজ্ঞপ্তি

প্রকাশ করতে পারত। কিন্তু দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সম্পর্কে শোনা কথাকে ভিত্তি করে এবং তা যাচাই-বাছাই না করেই নিন্দা জানিয়ে এ ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা উচিত নয়। কোন দেশের সেনাবাহিনীর কাছ থেকেই এ ধরনের স্পর্শকাতরতা কেউ আশা করে না। নইলে ইরাকে ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্যদের অবৈধ ও বর্বর অত্যাচার সম্পর্কে দিনের পর দিন যেসব অভিযোগ পশ্চিমা পত্র-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হচ্ছে, তার প্রতিবাদ জানাতে জানাতেই ওই দুই সেনাবাহিনীর জনসংযোগ দফতর ক্লান্ত হয়ে পড়ত। চিলে কান নিয়েছে শুনেই তো চিলের পেছনে দৌড়ানো উচিত নয়। আগে দেখা দরকার, কানটি যথাস্থানে আছে কিনা!

এখন দেখা যাক, কুলদীপ নায়ারের কাছে শেখ হাসিনা সত্যি সত্যি কী বলেছেন? আওয়ামী-নেত্রী একটু বেশি কথা বলে ফেলেন বলে অভিযোগ আছে। কিন্তু বেশি কথা বলা আর দায়িত্বহীন কথা বলা তো এক কথা নয়। শেরে বাংলা ফজলুল হক সম্পর্কেও বলা হতো তিনি বেশি কথা বলতেন। তিনি নিজেই একবার বলেছিলেন, "আমার সবচাইতে বড় শত্রু হচ্ছে নিজের জিহ্বা।" এই শেরে বাংলাও মার্কিন সাংবাদিক ক্যালাহানের কাছে কোন দায়িত্বহীন উক্তি করেননি বলে পরে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ক্যালাহান তার বক্তব্যকে টুয়িস্ট করেছিলেন; যেমন হাসিনার বক্তব্যকে টুয়িস্ট করেছেন কুলদীপ নায়ার।

হাসিনা যে কোন কারণেই ঢালাওভাবে সেনাবাহিনীর নিন্দা করতে পারেন না, তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলতে পারেন না, এমন কি তার বাবা-মা, ভাই, পরিবারের সবাইকে হত্যা করার জন্যও সেনাবাহিনীকে সামগ্রিকভাবে দায়ী করেন না, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি, আজ নয়, সাতাশ বছর আগেই। সে কথায় পরে আসছি। হাসিনা যে কথাটি কুলদীপ নায়ারকে বলতে পারেন, সে কথাটি হচ্ছে, "একুশের গ্রেনেড হামলার জন্য সেনাবাহিনীর একাংশ দায়ী, যারা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে।" নায়ার যে কোন কারণেই হোক এ কথাটিকে গোটা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছেন। তাতে যারা চেয়েছেন শেখ হাসিনা ও সেনাবাহিনীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হোক, বিতর্ক সৃষ্টি হোক, তারা বেজায় খুশি হয়েছেন।

এখন সাহস করে একটা স্পষ্ট কথা বলা দরকার। ষাটের দশকে পাকিস্তানি জমানায় বিচারপতি কায়ানী পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে বলেছিলেন, "পাকিস্তানের আর্মির একটাই গৌরব, তারা নিজের দেশ দুইবার দখল করতে পেরেছে।" এখানে কায়ানী পাকিস্তানে আর্মির দুই দুইবার অভ্যুত্থান ঘটানোর (একটি মীর্জা-আইয়ুবের, অন্যটি আইয়ুবের) প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। কই, তখন তো পাকিস্তানের সেনা সদর দফতর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করার জন্য পাগল হয়ে ওঠেনি! এমনকি কোনো কোনো পশ্চিমা দৈনিকে কোনো প্রভাবশালী কলামিস্ট যখন পাকিস্তান আর্মির নামের আগে বিশেষণ লাগান– ডডমেষণর দলভথরহ টরবহ' (ক্ষমতা-লোলুপ সেনাবাহিনী) তখন তো সেই সেনা সদর দফতর প্রতিবাদ জানানোর জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন না!

একথা সত্য, দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল পটভূমিতে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী। কিন্তু তাদের নামের পেছনে বারবার 'দেশপ্রেমিক' কথাটি লাগাতে হবে কেন? দেশের আপামর সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন পেশাজীবীরাও কি দেশপ্রেমিক নয়? না কি কেবল সেনাবাহিনীই দেশপ্রেমিক? যদি তাও হয়, গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে (মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায়) এই দেশপ্রেমিক শিশু সেনাবাহিনীর একাংশ যেসব কাণ্ডকীর্তি করেছে, তাতে কি তারা নিজেদের দেশপ্রেমের পরিচয় এবং এতো 'জেলাস্‌লি গার্ডেড' ভাবমূর্তি রক্ষা করতে পেরেছে? আমি সেসব কাণ্ডকীর্তির কথায় যাব না।' জাতির পিতা-হত্যা থেকে শুরু করে দু'টি বড় এবং কয়েকটি ছোট অভ্যুত্থান ঘটানো, তাদের যৌথ ক্লিনহার্ট অপারেশনে অর্ধশতাধিক মানুষের বিনা বিচারে "হৃদরোগে মৃত্যুর" কথা দেশবাসীর সকলেরই জানা। চট্টগ্রামের হালিশহরে এই সেনাবাহিনীর একাংশ নিজের দেশের মানুষের উপর যে অত্যাচার চালিয়েছে, তা অনেককে '৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদারদের বর্বরতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আমাদের সেনা কর্মকর্তাদের উচিত, তাদের একাংশের অতীতের কুকর্মের লেগাসি থেকে সেনাবাহিনীর সুনাম উদ্ধার করা। একমাত্র তাহলেই এই সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি সুন্দর হবে, দেশপ্রেম উজ্জ্বল হবে।

শেখ হাসিনা যদি বাংলাদেশ আর্মির একাংশের অতীতের কাণ্ডকীর্তির কথা স্মরণ করে এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনার প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক গ্রেনেড হামলায় সেই একাংশের জড়িত থাকার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে কি খুব অন্যায় বা অস্বাভাবিক কাজ করেছেন? সেনাবাহিনীর হাইকম্যান্ডের তো উচিত, সেনাবাহিনীকে অতীতের লেগাসিমুক্ত করা, তার সুনাম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং দেশবাসীর মনে সেনাবাহিনীর উপর ভরসা ও বিশ্বাস আবার জাগিয়ে তোলা। ২০০১ সালের অক্টোবর নির্বাচনের সময় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের যে অভিযোগ উঠেছে এবং বর্তমান ক্ষমতাসীনেরা সেনাবাহিনীতেও দলীয়করণের চেষ্টা চালাচ্ছে বলে যে জনরব বাতাসে ভাসছে, তা দূর করার কাজেই সেনাপ্রধানদের মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

আগেই বলেছি, আট-একুশের গ্রেনেড হামলায় গোটা আর্মি জড়িত ছিল বলে শেখ হাসিনা মন্তব্য করেছেন– একথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। বরং এই আর্মি সম্পর্কে হাসিনার আস্থা ও ভালোবাসা আমাকে মাঝে মাঝে বিস্মিত ও বিরক্ত করেছে। হাসিনার ধারণা, এই আর্মি বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া আর্মি এবং মুক্তিযুদ্ধে তার অতুলনীয় ভূমিকা রয়েছে। জেনারেল জিয়া এবং কর্নেল রশীদ ও ফারুকের দল হীন রাজনৈতিক চক্রান্তে এই আর্মির একাংশকে ব্যবহার করে তাদের সুনাম ও ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। আর্মির এই সুনাম ও ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার এবং রক্ষা করা প্রয়োজন।

আমি হাসিনার এই মনোভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই ১৯৭৭ সালে। এই সময় প্রবাসী বাঙালিদের সামরিক শাসন-বিরোধী আন্দোলনের পক্ষ থেকে সুইডেনের স্টকহোমে একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়। সুইডেনে বঙ্গবন্ধুর আমলে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত আবদুর রাজ্জাক (তখন অপসারিত) ছিলেন এই সম্মেলনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। শেখ হাসিনা তখন দিল্লিতে অবস্থান করছিলেন। ঠিক হলো, তিনি যখন সে সময় স্টকহোমে যেতে পারছেন না, তখন তার একটি বাণী পাঠ করা হবে সম্মেলনে। এই বাণীটি ড্রাফট করার দায়িত্ব পড়েছিল আমার উপর।

আমি এই বাণীতে উল্লেখ করেছিলাম, '১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধুর সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং তিনি সপরিবারে নিহত হন।' এই খসড়াটি অনুমোদনের জন্য হাসিনার কাছে পাঠানো হলে তিনি আপত্তি করেন এবং আমাকে জানান, '১৫ আগস্টের ঘটনার জন্য তার পিতার হাতে গড়া সেনাবাহিনী দায়ী নয়। দায়ী সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কৃত, পথভ্রষ্ট একদল সেনা অফিসার।' তার বাণীতে তাদেরই নিন্দা জানাতে হবে; সেনাবাহিনীকে নয়। আমি তার ইচ্ছানুসারে খসড়া শুভেচ্ছাবাণীটি নতুনভাবে লিখেছিলাম। যদিও দীর্ঘদিন আগের ঘটনা, তাহলেও সুইডেনে প্রেরিত শেখ হাসিনার শুভেচ্ছাবাণী সম্বলিত উক্ত সম্মেলনের একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার কপি নিশ্চয়ই স্টকহোমে অথবা ঢাকায় আওয়ামী লীগের কারও না কারও কাছে আছে। এই পুস্তিকায় মুদ্রিত শুভেচ্ছাবাণী থেকেও সেনাবাহিনী সম্পর্কে শেখ হাসিনার প্রকৃত মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রতি এই অনুরাগ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী থাকাকালেও দেখিয়েছেন। তিনি সেনাবাহিনীর পোশাক পরে তাদের সঙ্গে খেতে বসেছেন। সেনাবাহিনীর নানা উন্নয়ন কার্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়েছেন। পাকিস্তানী ব্যারাকের কায়দায় এক বেলা রুটি খাওয়ার বদলে জওয়ানদের জন্য দু'বেলাই ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তারপরেও দিল্লি থেকে উড়ে আসা এক কলামিস্টের লেখাকে সম্বল করে সেনা সদর দফতরকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কণ্ঠে হাসিনা-নিন্দায় কণ্ঠ মেলাতে হবে?

বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে আওয়ামী লীগের হাতে নয়; হয়েছে বিএনপির হাতে। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমানই তার ক্ষমতা দখলের কাজে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেন। সেনাবাহিনীতে চেইন অব কম্যান্ড ফিরিয়ে আনার নাম করে (এটি ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনামের থিয়োরি) কয়েক শ' মুক্তিযোদ্ধাকে জেলের ভেতরে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেন। সদ্য গড়ে ওঠা বিমানবাহিনীর দক্ষ অফিসারদের ধ্বংস করেন। সামরিক ট্রাইব্যুনালের বিচার প্রহসনে মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহেরকে হত্যা সামরিক বাহিনীর একাংশের দুরপনেয় কলঙ্ক। তারপর জেনারেল জিয়া নিজেই সামরিক বাহিনীর একাংশের হাতে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসের বিছানায় শুয়ে "শহীদ" হন। দীর্ঘ ষোল বছরের একটানা সামরিক শাসনে দুর্নীতি, অপশাসন, ক্ষমতার অপব্যবহার ও গণনির্যাতনের দায়ে সামরিক বাহিনীরই ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। এ জন্যে সামরিক বাহিনীরই ক্ষমতালোভী একদল উচ্চপদস্থ অফিসারের বিচার ও শাস্তি হওয়া উচিত ছিল। যেমন হয়েছে চিলিতে, দক্ষিণ কোরিয়া এবং আর্জেন্টিনায়। তাতে এই দেশগুলোর সেনাবাহিনী কলঙ্কমুক্ত হয়েছে, আবার জনগণের আস্থা ও ভালোবাসা ফিরে পেয়েছে।

বাংলাদেশ আর্মির একাংশের এবং তাদের ক্ষমতালোভী একশ্রেণীর জেনারেলের কার্যকলাপের জন্য যদি তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট না হতো, তাহলে আজ বিশ্বে শুধু দক্ষ পেশাদার বাহিনী হিসেবে নয়, একটি লিবারেশন আর্মি হিসেবে এই তরুণ সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা পেতো। গত সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোট ভোটারদের ভয় পাওয়ানো এবং আওয়ামী লীগের সমর্থক, নির্বাচন প্রার্থী ও কর্মীদের উপর নির্যাতন চালানোর কাজে এই বাহিনীর একাংশকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের মনেও তাদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। সেনাপ্রধানদের উচিত, প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নয়, সেনাবাহিনীর আচরণ, মনোভাব ও কার্যক্রম দ্বারা কিভাবে তাদের নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ ভূমিকা সম্পর্কে দেশবাসীর মনে আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা যায় সে জন্য চেষ্টা করা। আমি নিজেও বিদেশে বসে এই সেনাবাহিনীর জন্য গর্বিত হতে চাই। চাই বিদেশেও তাদের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে উঠুক।

আট-একুশের গ্রেনেড হামলার প্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরেছেন সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব) এম. মুস্তাফিজুর রহামন বি.বি. তার সাম্প্রতিক নিবন্ধে। এ প্রশ্নগুলো গ্রেনেড হামলার ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। দেশবাসীর মন থেকে সকল সন্দেহ দূর করার জন্য সেনা হাইকম্যান্ডের উচিত এই প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দেওয়া। গ্রেনেড হামলার রহস্য এবং সে সম্পর্কে অভিযোগ ও সন্দেহ দূর করতে হলে সাবেক সেনাপ্রধানের প্রশ্নগুলোর সঠিক সদুত্তর দেশবাসীর জানা দরকার।

সন্দেহ নেই, ক্ষমতাসীন জোট সরকার চেয়েছিল আওয়ামী লীগ ও সেনাবাহিনীকে একটি মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড় করাতে। এ জন্যেই হাসিনাকে একটি অবাঞ্ছিত বিতর্কে জড়ানো হয়েছে এবং এই বিতর্কে জড়ানোর জন্য একজন বিতর্কিত সাংবাদিককেই দিল্লি থেকে ডেকে আনা হয়েছে। কিন্তু গ্রেনেড হামলার মতো এই কলম হামলাও ব্যর্থ হয়েছে। দেশের মানুষকে যে বারংবার ধোঁকা দেওয়া যায় না, এই চরম সত্যটি হয়তো জোট সরকারকে একদিন চরম মূল্য দিয়ে শিখতে হবে। সেদিনটিও কি খুব বেশি দূরে?

লন্ডন ॥৫ অক্টোবর মঙ্গলবার ॥২০০৪

আন্তর্জাতিক ইনফরম্যাটিক্স অলিম্পিয়াড

মোহাম্মদ কায়কোবাদ

আন্তর্জাতিক ইনফরম্যাটিক্স অলিম্পিয়াডের (আইওআই) ১৬তম আসর বসেছিল গ্রীসের এথেন্স শহরে গত ১১-১৮ সেপ্টেম্বর। অলিম্পিকের সূতিকাগার গ্রীসে এ বছর অলিম্পিক খেলার আসরও জমেছিল। সেই সূত্র ধরেই আন্তর্জাতিক গণিত এবং ইনফরম্যাটিক্স অলিম্পিয়াডও তারা আয়োজন করল। অবশ্য তৃতীয় অলিম্পিয়াডও তারা আয়োজন করেছিল ১৯৯১ সালে। সেই হিসাবে গ্রীসই একমাত্র দেশ যে একাধিক বার ইনফরম্যাটিক্স অলিম্পিয়াড আয়োজন করল। ১৯৮৯ সালে ইনফরম্যাটিক্স অলিম্পিয়াড প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হয় বুলগেরিয়াতে। ১৯৮৭ সালে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্য এরকম একটি প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য ইউনেস্কোতে কথা হয়। গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতো বিষয়েও নিয়মিত অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্বভাবতই আইওআইয়ের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। প্রতি আসরেই প্রতিযোগী দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৭ সালে দেশের সংখ্যা ছিল ৬৫, ২০০০ সালে ৬৭, ২০০১ সালে ৭২ এবং এবার ২০০৪ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৯-তে, অবশ্য এর মধ্যে বাংলাদেশ পর্যবেক্ষক হিসাবে। এই সংস্থার সদস্য হতে হলে প্রথম বছর পর্যবেক্ষক থাকতে হয় ঠিক আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের মতো।

নিয়মাবলী

প্রতিটি দেশের আইওআই দলের সর্বোচ্চ চারজন প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র এবং একজন করে নেতা, উপনেতা থাকতে পারে। প্রতিযোগিতাটি যদিও দলভিত্তিক নয় তবে প্রতিটি দেশের ছাত্রদের স্কোর যোগ করে অনেক সময় একটি আনঅফিসিয়াল র‍্যাংক দেয়া হয়, যাতে দেশে দেশে সুস্থ প্রতিযোগিতা গড়ে ওঠে। এই প্রতিযোগিতায় দু'দিনে ছাত্রদের তিনটি করে সমস্যা সমাধানের জন্য দেয়া হয়, যা সাধারণত এ্যালগরিদমপ্রধান। সমাধান হিসাবে কখনও কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কখনওবা নির্দিষ্ট ইনপুট ফাইলের বিপরীতে উত্তরসংবলিত ফাইল বিচারকদের কাছে পাঠাতে হয়। প্রতিটি সমস্যার সমাধান ১০০ নম্বরে যাচাই করা হয় সাধারণত দশটি ইনপুট সেটের বিপরীতে। প্রতিযোগিতার দুই দিনের মধ্যে একদিন পার্থক্য রাখা হয়। এবার দলগুলো ১১ সেপ্টেম্বর পৌঁছে। ১৩ ও ১৫ সেপ্টেম্বর ছিল প্রতিযোগিতার দিন, ৯টা থেকে ২টা পর্যন্ত পাঁচ ঘণ্টার প্রতিযোগিতা ১২ সেপ্টেম্বর উদ্বোধনী শেষে অনুশীলনী এবং ১৭ সেপ্টেম্বর পুরস্কার বিতরণী। এর মধ্যে অবশ্য প্রাচীন গ্রীসের নানা উল্লেখযোগ্য স্থান এবং দ্বীপ দর্শন।

প্রতি প্রতিযোগীর জন্য কম্পিউটারে উইন্ডোজ এক্সপি প্রো এবং রেড হ্যাট ৯.০ লিনাক্স ইনস্টল করা ছিল। সি এবং প্যাসক্যাল ভাষায় প্রোগ্রাম লেখার জন্য প্রয়োজনীয় এনভায়রনমেন্টও ছিল। প্রতিযোগিতার কক্ষে সাদা কাগজ, কলম, পেন্সিল ও রবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রয়োজনে যে কোন প্রতিযোগী কি-বোর্ড কিংবা নিজস্ব মাউস ব্যবহার করার অনুমতি নিতে পারে। কোন রকম কমিউনিকেশন ডিভাইস, ক্যালকুলেটর প্রতিযোগিতার কক্ষে নেয়া নিষিদ্ধ ছিল। প্রতিযোগিতার ঠিক আগের দিন সন্ধ্যায় সমস্যাগুলো নিয়ে সকল দেশের নেতাদের মধ্যে আলোচনা হয়, ভুলত্রুটি কিংবা সমস্যার জটিলতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ হয়। যে সকল দেশ মনে করে তাদের প্রতিযোগীদের ইংরেজী ভাষায় লিখিত সমস্যাগুলো অনুবাদ করে দিতে হবে তারা অনুবাদ কক্ষে অনুবাদ করতে পারে। তবে নেতা-উপনেতারা সমস্যা জানার পর প্রতিযোগীদের সংস্পর্শে যাতে না আসে তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। প্রতিযোগিতার প্রথম ঘণ্টায় প্রতিযোগীরা সমস্যাগুলো সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে পারে, যার উত্তর সাধারণত হয় হ্যাঁ অথবা না অথবা কোন বক্তব্য নেই। প্রতিদিন প্রতিযোগিতার পর ফল ঘোষণা করা হয় এবং এর সঙ্গে দ্বিমত থাকলে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় প্রতিযোগিতার পরের দিন পদক সংশ্লিষ্ট আলোচনা হয়। আইওআইয়ের নিয়মানুসারে ১২ ভাগের ১ অংশ প্রতিযোগীকে স্বর্ণ, ৬ ভাগের ১ অংশকে রৌপ্য এবং ৪ ভাগের ১ অংশকে ব্রোঞ্জপদক দেয়া হয়, অর্থাৎ অর্ধেক প্রতিযোগীকে কোন না কোন পদক দেয়া হয়। এবার প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২৯০। এর মধ্যে ১৪৬ জনকে পদক দেয়া হয়– যার মধ্যে ২৬ জনকে স্বর্ণ, ৪৯ জনকে রৌপ্য এবং ৭১ জনকে ব্রোঞ্জ।

এবারের ফলাফল

৬০০ নম্বরে ৫৬৫ পেয়ে এবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গ্রেট ব্রিটেনের পল জেফ্রিস, ৫৬০ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চীনের ওয়েডং হু, তৃতীয় স্থানে একই দেশের তিয়ানচেং লু ৫৩০ পেয়ে এবং চতুর্থ স্থানেও চীনের শি লি যার স্কোর ৫২০, পঞ্চম হয়েছে পোল্যান্ডের বারলোসিয়েজ রোমানস্কি, তার পর রয়েছে ক্রোয়েশিয়ার লুকা কালিনোভসিস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রায়ান জ্যাকোবস, থাইল্যান্ডের ভাসান চিয়েনমা নিতাউইসিন, ক্রোয়েশিয়ার গডরো পুজার এবং রাশিয়ার কিরিল বাতুজভ। দলগতভাবে চীনের প্রতিযোগীরা ২, ৩, ৪ এবং ১৩তম স্থানে, রাশিয়ানরা ১০, ১১, ১৭ এবং ২৪তম স্থানে। স্বর্ণপদক আরও পেয়েছে সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, কোরিয়া, ইরান, রুমানিয়া, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, বুলগেরিয়া এবং ইতালির প্রতিযোগীরা। শ্রীলঙ্কার চারজনই পদক পেয়েছে যার তিনজন ব্রোঞ্জ, থাইল্যান্ডের প্রতিটি পদক একটি করে, ভারত এবং ভিয়েতনাম একটি রৌপ্য ও দুটি ব্রোঞ্জ, ইরান তিনটি রৌপ্য, ইন্দোনেশিয়া দুটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ, তিউনিসিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা একটি করে ব্রোঞ্জ। পদক পাওয়ার জন্য সর্বনিম্ন স্কোর ছিল ২৬৫।

আইওআই-২০০৪-এর ভেন্যু ছিল এথেন্সের মারুছিতে অলিম্পিক খেলার জন্য তৈরি মিডিয়া ভিলেজে। লেভেল-১-এ ছিল প্রতিযোগিতার কক্ষ এবং জেনারেল এ্যাসেম্বলির কক্ষ, লেভেল-০ তে রিসিপশন, অনুবাদ কক্ষ, রেস্টুরেন্ট, সুইমিংপুল, ইন্টারন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্টিফিক কমিটির সভাকক্ষ, লেভেল-১-এ নেতাদের কক্ষ, লেভেল-২-এ গাইডদের কক্ষ এবং লেভেল-৩ প্রতিযোগীদের কক্ষ।

এই প্রতিযোগিতায় নেতা হিসাবে অনেক ক্ষেত্রেই এসেছেন এসিএম আইসিপিসির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোচ। যেমন ইরান, তাইওয়ান, চেক প্রজাতন্ত্র কিংবা প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের কিছু দেশ। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় যারা ভাল করে তাদের অধিকাংশই গণিত কিংবা ইনফরম্যাটিক্স অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়।

অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের জন্য ইতোমধ্যেই অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এবার আমরা পর্যবেক্ষক হিসাবে অংশগ্রহণ করেছি, আগামীবারই আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এই মেধার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তাদের গাণিতিক দক্ষতার প্রমাণ রাখতে পারবে। ঠিক একইভাবে এবার পর্যবেক্ষক হিসাবে আইওআইতে যোগদানের ফলে আগামী বছর ১৮-২৫ আগস্ট পোল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য প্রতিযোগিতায়ও আমরা দল পাঠাতে পারব। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নিয়ে অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবালকে সভাপতি করে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ইনফরম্যাটিক্স অলিম্পিয়াড কমিটি গঠিত হয়েছে, যা খুব শীঘ্রই একটি জাতীয় প্রতিযোগিতা আয়োজন করবে। এভাবে একে একে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান কিংবা জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতো বিষয়েও আমাদের অংশগ্রহণ করা উচিত। থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত, কুয়েত, জর্দান, সৌদি আরব, তিউনিসিয়া যদি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে তাহলে আমাদের জনবহুল বাংলাদেশ, যার অগ্রগতির একমাত্র পথ মানবসম্পদ উন্নয়ন, পারবে না কেন? বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য না থাকলেও অংশগ্রহণে আমাদের আগ্রহের কমতি নেই, কিন্তু মেধার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের উদ্যোগে যথেষ্ট কমতি রয়েছে। অথচ সেখানে অংশগ্রহণ করলে আমাদের সাফল্য লাভের সম্ভাবনা অধিক।

উপসংহার

বিশ্বায়নের এই যুগে বাংলাদেশের একমাত্র উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা যার যথাযথ উন্নয়ন ঘটিয়ে তাকে রফতানিযোগ্য করা যায়। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের পথ হলো তাকে শিক্ষিত করা, প্রশিক্ষিত করা, তার দক্ষতা বৃদ্ধি করা। আর এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির শিক্ষা। আমরা জানি আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যথাযথ প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব রয়েছে, অভাব রয়েছে শিক্ষা উপকরণের, ভৌত অবকাঠামোতে, ল্যাবরেটরিতে। এমতাবস্থায় শিক্ষার মান বৃদ্ধির একমাত্র ব্যয়সাশ্রয়ী উপায় হলো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এলাকায় এলাকায় মেধাভিত্তিক প্রতিযোগিতাকে জনপ্রিয় করে তোলা। আমরা দেখেছি এসিএম প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ছাত্ররা ধারাবাহিক সাফল্যের মাধ্যমে তাদের কম্পিউটার মেধা এবং দক্ষতার প্রমাণ রেখেছে। পরপর সাতবার এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে তাদের সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আমাদের তরুণদের প্রশংসনীয় প্রোগ্রামিং দক্ষতা বিশ্বের কাছে প্রমাণ করে। ২০০০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অরল্যান্ডোতে অনুষ্ঠিত ২৪তম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পিছনে ফেলে একাদশ স্থান দখল করেছে। আমাদের স্কুল-কলেজের ছাত্রদের প্রোগ্রামিং দক্ষতা এবং আগ্রহ অত্যন্ত প্রশংসনীয়, যার প্রমাণ তাদের জন্য আয়োজিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অংশগ্রহণে আয়োজিত প্রতিযোগিতার ফলাফল।

তাদের এই প্রোগ্রামিং মেধাকে বিকশিত করার জন্য জাতীয় ভিত্তিতে এ ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ ইনফরম্যাটিক্স অলিম্পিয়াড কমিটি এ ধরনের একটি প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই প্রতিযোগিতাকে জনপ্রিয় করার জন্য একটি জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকার সাহায্য প্রয়োজন এবং সংশ্লিষ্ট ইভেন্টগুলো আয়োজনের জন্য স্পন্সরও প্রয়োজন। আমাদের দেশের অগ্রগতিকে সামনে রেখে আশা করি এই উদ্যোগকে সমর্থন জানানোর জন্য সমমনা প্রতিষ্ঠানগুলো এগিয়ে আসবে এবং এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের প্রোগ্রামিং দক্ষতা প্রশংসনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে।

সন্ত্রাসীদের ফাইভস্টার ট্রিটমেন্ট

মাসুদা ভাট্টি

জোট সরকার যে, এত তাড়াতাড়ি ভয় পেয়ে যাবে সেটা ভাবিনি, কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে জোট সরকার শুধু ভয়ই পায়নি, বরং প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এই ভয়ে ভীত হয়ে এমন সব আচরণ ও কথা বলতে শুরু করেছেন যা রীতিমতো হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুমিল্লার জনসভায় প্রধানমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীনভাবে উচ্চারণ করেছেন যে, একটি রাজনৈতিক দল নাকি বিদেশী শক্তির সহায়তায় ক্ষমতায় যেতে চাইছে। এই একটি দল কারা সেটি আর স্পষ্ট করে বলতে হবে না কাউকে, সবাই বুঝতে পারছে।

কী আশ্চর্য, সন্ত্রাস দমনে ক্লিনহার্ট অপারেশন, র‍্যাব (র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন) ও সর্বশেষ চিতা নামের কমান্ডো টিম গঠন করা হয়েছে। সবচেয়ে ভয়ের কথা হলো, অপারেশন ক্লিনহার্টে গণ-হৃদরোগে অর্ধশত মানুষের মৃত্যুর পর র‍্যাবের হাতে 'ক্রসফায়ারে' মৃতের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ত্রিশে। সব মিলিয়ে দু'হাজার চার সালের নয় মাসে পুলিশের হেফাজতে মৃতের সংখ্যা দেড় শ'র কাছাকাছি। যদিও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবরে এই সংখ্যা প্রায় চার শ'। দুই দফায় মানে গত এপ্রিল আর সেপ্টেম্বরে পুলিশ পনেরো হাজার মানুষকে গ্রেফতার করেছে এবং এদের প্রত্যেককেই পুলিশের হাতে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের পরিবারের অবস্থা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না। পত্রপত্রিকার পাতায় গ্রেফতারকৃতদের আত্মীয়স্বজনের তীর্থের কাকের মতো বসে থাকার ছবি দেখলে সভ্য বিবেক কেঁপে উঠবে।

যখন এই লেখাটি লিখছি তখন বাংলাদেশের প্রত্যেকটি দৈনিকের প্রথম পাতায় প্রকাশিত ছবিটির কথা পাঠককে মনে করিয়ে দেব। কয়েকটি ভ্যানের ওপর শায়িত রক্তাক্ত দেহ। চট্টগ্রামের কথিত সন্ত্রাসী ও তার কয়েক সঙ্গীর মৃতদেহ এভাবেই ছবি হিসেবে বেরিয়েছে। ব্রিটেন হলে এ রকম ছবি প্রকাশ করার জন্য পত্রিকাগুলোকে জবাবদিহি করতে হতো। কিন্তু বাংলাদেশে হয়ত এই ছবিগুলো সরকারী সংস্থা থেকেই সরবরাহ করা হয়ে থাকবে। আমরা এখনও ভুলতে পারি না, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পদুয়ার সেই ঘটনার কথা, ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের লাশ বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার ছবিগুলো নাকি কর্তৃপক্ষই সরবরাহ করেছিল। জানি না, হয়ত চট্টগ্রামের ছবিগুলোও সে রকমই। সরকারের উদ্দেশ্য এখানে স্পষ্ট, সরকার চাইছে জনগণকে বোঝাতে যে, তারা সন্ত্রাস দমনে কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। র‍্যাব আর চিতা দিয়ে কথিত সন্ত্রাসীদের হত্যা করা হয়েছে। আমি অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেও বলতে শুনেছি যে, এই সন্ত্রাসীদের হত্যা করে সরকার খুব ভাল কাজ করছে। কোন রকম বিচার ছাড়াই, আত্মপক্ষ সমর্থন ছাড়াই কাউকে হত্যা করা কোন সভ্য বিবেক কী করে সমর্থন করে–সেই প্রশ্ন করে লাভ নেই। কারণ জোট সরকার সেই প্রশ্নের অবকাশ রাখেনি আর। তাদের যা খুশি তাই তারা করছে, প্রশ্ন করলেই প্রশ্নকারীকেও যে র‍্যাব বা চিতার থাবায় প্রাণ হারাতে হবে কি না, সে নিশ্চয়তা তো কেউ কাউকে দিতে পারবে না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এভাবে ঢালাওভাবে হত্যা করে সন্ত্রাস নির্মূল করা যাবে কি না। এ কথা আমরা কেউ বলছি না যে, এভাবে বিনা বিচারে হত্যা করে সরকার নিজেও যে সন্ত্রাসী হয়ে উঠছে। বহু জ্ঞানপাপী প্রায়শই বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে সৃষ্ট রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারের কথা বলেন। তাঁরা সিরাজ সিকদারের হত্যাকাণ্ডের উদাহরণ তুলে গলা ফাটিয়ে ফেলেন। কিন্তু আজকের র‍্যাব ও চিতার হাতে নিহতদের সম্পর্কে কোন কথা তাঁদের মুখে আসে না। গ্রেফতারের পরও কী করে কারও সঙ্গে 'ক্রসফায়ার'-এর ঘটনা ঘটে আর সেই ঘটনায় র‍্যাব-এর কারও কিছু হয় না, শুধু টার্গেটটিরই মৃত্যু হয়, সেই প্রশ্নও কারও মুখে নেই। মুখে নেই, কারণ বাংলাদেশে মুখ বন্ধ করা খুব সোজা, আদরযত্নে কাজ না হলে ভয়ভীতি তো আছেই, তাতেও কাজ না হলে নিজের প্রাণকে তো ভালবাসতেই হয়, নাকি? কেউ অবশ্য এ কথাও বলছে না যে, এভাবে কথিত সন্ত্রাসীদের বিনাবিচারে হত্যা করে সন্ত্রাস কতটা কমছে? গড়ে প্রতিদিন মৃত্যুর সংখ্যা কমছে কি? ধর্ষণ, চাঁদাবাজি ইত্যাদির ভয়াবহতাই বা কতটা কমছে? গত নয় মাসে শুধু ধর্ষণের শিকার হয়েছে সাত শ' নারী ও শিশু, এদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে নব্বই জনের। এক শ' তিরানব্বই নারী হয়েছে এ্যাসিডের শিকার (সূত্র : মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান 'অধিকার'-এর রিপোর্ট)। আমরা এ রকম প্রশ্নও কেউ তুলছি না যে, সভ্যজগতের কোন রাষ্ট্রে সন্ত্রাস দমনে এভাবে নিয়মিত বাহিনীকে কোথাও বিনাবিচারে কাউকে হত্যার অনুমতি দেয়া হয়েছে কি না? পাকিস্তানের মতো স্বৈরশাসনের রাষ্ট্রেও এ রকম কোন ঘটনার কথা শোনা যায়নি। অথচ সেখানে সন্ত্রাসী ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক। দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশেই এ রকম নজির নেই, এশিয়ার বাইরে তো প্রশ্নই আসে না। আফ্রিকার অনেক পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রেও এ রকম কোন নির্দেশের কথা আমাদের জানা নেই। তবে বাংলাদেশে এ রকম একটি বাহিনী গঠন করে ঢালাও হত্যার নির্দেশ দেয়া হলো কেন? তাও আবার এমন একটি সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে এই কাণ্ডটি ঘটছে, যারা নিজেদের গণতান্ত্রিক বলে পরিচয় দিতে ভালবাসে।

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের বেশ খানিকটা পেছনে ফিরে তাকাতে হবে। আমরা অনেক দূরে যেতে পারতাম, কিন্তু না, আমরা ২০০১-এর অক্টোবর নির্বাচন পর্যন্তই পেছনে ফিরে তাকাব। আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের শাসনকালের শেষ দিকে সন্ত্রাসী তৎপরতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তা আওয়ামী লীগ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। কারণ যাকেই তখন গ্রেফতার করা হচ্ছিল, তৎকালীন বিরোধী দল তাকেই তাদের দলীয় নেতাকর্মী বলে বিরোধিতা করছিল। এমতাবস্থায় যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এলো তখন লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে ওই তিন মাসের সরকার শুধু নির্বাচন পরিচালনা এবং কী করে নির্বাচনে জোটের বিজয় লাভ সম্ভব হয় তা নিয়েই মাথা ঘামিয়েছে। আমরা দেখেছি, বিচারপতি লতিফুর রহমান তাদের উপদেষ্টাদের নিয়ে নির্বাচনে জোটের বিজয়ের নীলনক্সা বাস্তবায়নেই বেশি সময় ব্যয় করেছেন এবং আশ্চর্যজনকভাবে সেনাবাহিনীও সেই নক্সা বাস্তবায়নেই কাজ করেছে। নইলে, বেছে বেছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের পানিতে নামিয়ে চুবানো, কান ধরে ওঠ-বস করানোর ঘটনার অন্য কোন ব্যাখ্যা আমরা দাঁড় করাতে পারি না। নির্বাচনে জয়লাভ করে দেশের ভেতরকার চরম অরাজক অবস্থার বর্ণনা তো দেশে-বিদেশের সংবাদ মাধ্যমে বেশ ভালভাবেই বর্ণিত হয়েছে। চর্বিত চর্বণের আবশ্যকতা দেখছি না। শুধু এটুকু বলেই এর ইতি টানতে চাই যে, যারা তখন দেশের ভেতর ধর্ষণ, লুণ্ঠন, সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগের ওপর অকাতরে হামলা চালিয়েছে তারা সকলেই সরকারের ও নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ করে পুলিশের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছে। হত্যা ও ধর্ষণের মতো ন্যক্কারজনক অপরাধ করার পরও যখন পুলিশ মামলা নেয়নি, বরং ধর্ষক ও হত্যাকারীকে পুলিশ জামাই আদর দিয়েছে, তখন তারা আরও ভয়াবহ অপরাধের দিকে হাত বাড়িয়েছে। তারা ধীরে ধীরে একেকটি ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সরকার এসব দেখেও না দেখার ভান করেছে, কারণ এদের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা নিয়েই সরকার ক্ষমতায় এসেছে। ফলে তাদের কাছে সরকারের ঋণের বোঝা এভাবেই চুকাতে হয়েছে।

এরপর সরকার যখন ক্ষমতায় এসেছে তখন জেল থেকে হাজার হাজার সন্ত্রাসীকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। সরকার শুধু এদের মুক্তি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, এদের পুলিশ বাহিনীতেও নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সন্ত্রাসীদের জেল থেকে বের করে এভাবে মাঠে নামিয়ে দেয়ার উদাহরণ বিরল। অবশ্য জোট সরকারের জন্য বিষয়টি নতুন কিছু নয়। কারণ এই সরকারের প্রধান শরিক বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়া জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার খুনীদের রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করেই ক্ষান্ত হননি, এদের রাষ্ট্রীয়ভাবে পুনর্বাসিত করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেও বাঁচতে পারেননি, কিন্তু সন্ত্রাসী বা রাষ্ট্রীয় খুনীদের পুনর্বাসনের যে ধারাবাহিকতা তিনি শুরু করে গিয়েছিলেন তাঁর পত্নী বেগম খালেদা জিয়া সেই ধারাবাহিকতাই বজায় রেখে চলেছেন।

খালেদা-নিজামী জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর একদিকে যেমন জেলখানা থেকে সন্ত্রাসীদের মুক্তি দেয়া হয়েছে তেমনই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত আসামীদের জামাই-আদর দেয়া হয়েছে। জাতীয় চার নেতাকে হত্যাকারীদের দেয়া হয়েছে জামিনে মুক্তি, দেয়া হয়েছে পার্লামেন্টে গলাবাজি করার অধিকার। কোন সভ্য দেশে একজন হত্যা মামলার আসামীকে এভাবে সংসদ সদস্য পদে থাকার অধিকার দেয়া হতো কি না সন্দেহ কিন্তু বাংলাদেশ বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এখন আবার নতুন উপসর্গ যুক্ত হয়েছে, হত্যা মামলার বিচারকগণ কখনও বিব্রতবোধ করেন, কখনওবা ক্রনিক ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হন। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই বিচারকগণও কার ভরসায় এ রকম বিব্রত বা অসুস্থ হতে পারেন! সবচেয়ে মজার ও আশ্চর্যের হলো, জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ডের অন্যতম আসামী মেজর (অব) খায়রুজ্জামানকে শুধু চাকরিই ফিরিয়ে দেয়া হয়নি বরং সম্প্রতি তাকে পদোন্নতিও দেয়া হয়েছে। ভাবখানা এ রকম, পদোন্নতি দেয়ার যেন লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে, ধরে বেঁধে খায়রুজ্জামানকেই পদোন্নতি দিতে হলো। এর পরও কেউ কি করে বিশ্বাস করবে যে, সরকার দেশের বরেণ্য নেতৃবৃন্দের হত্যাকাণ্ডের বিচারে আন্তরিক? আমাদের আইনমন্ত্রী নোয়াখালীর হলেও তাঁর আঞ্চলিক উচ্চারণ ছেড়ে অত্যন্ত সুললিত শুদ্ধ উচ্চারণে যখন বলেন, "দেশের আইন তার স্বাভাবিক গতিতে চলছে, আইনের পথে কোন বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে না", তখন বলতে ইচ্ছে করে, ধরণী দ্বিধা হও, বাঙালী জাতির যাওয়ার আর কোন জায়গা সত্যিই অবশিষ্ট নেই, তোমাতে স্থান নেয়া ছাড়া।

বিরোধী দলকে মোকাবিলায় জোট সরকার যে স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করেছে তা এককথায় বার্বারিক বা বর্বর পন্থা বললে অত্যুক্তি হবে না। বোমা মেরে নিশ্চিহ্ন করার হাত থেকে তারা বিরোধী দলকে তথা দলটির নেতাকে রক্ষা করতে পারছে না। বরং উল্টো এই বোমা হামলার দায়ভারও তারা তুলে দিচ্ছে বিরোধী দলেরই কাঁধে। এক সদস্যবিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির প্রকাশিতব্য রিপোর্ট সম্পর্কে যতদূর জানা গেছে তাতে এই রিপোর্টে আর কিছুই নয়, বিরোধী দলকেই এই গ্রেনেড হামলার জন্য দায়ী করা হয়েছে। অর্থাৎ বিরোধী দল নিজেরাই গ্রেনেড হামলা করে তাদের নেতাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। এই হাস্যকর যুক্তি দিয়ে দেশবাসীকে সরকার আর যাই-ই কিছু বোঝাক না কেন, সন্ত্রাস দমনে সরকারের আন্তরিকতার প্রমাণ যে তারা দিতে পারবে না সেটা নিশ্চিত। এত বড় একটি ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা ঘটে যাওয়ার পর বিরোধী দলের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বাধা সৃষ্টির জন্য সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অশান্তিও চোখে পড়ার মতো। তিনি নিজে নির্দেশ দিয়ে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করতে বলেছেন। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টকে এই গণগ্রেফতার বন্ধে সরকারকে নির্দেশ দিতে হয়েছে। এখানে আমাদের স্মরণ করতে হয় যে, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিশ্ব বিখ্যাত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সরকারের কাছে মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য যত আবেদন জানিয়েছে বাংলাদেশের গোটা ইতিহাসে তত আবেদন জানানো হয়নি। এর আগে জেনারেল জিয়ার অকাতরে মুক্তিযোদ্ধা হত্যাকাণ্ডের সময়ও এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এ রকম আবেদন জানিয়েছিল তা বন্ধ করার জন্য। বাংলাদেশ কখনও হচ্ছে ব্যর্থ রাষ্ট্র, কখনও বাংলাদেশ হচ্ছে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র। কিন্তু এতে জোট সরকারের কিছু এসে যায় না, তারা দেশের ভাবমূর্তির নষ্ট করার জন্য বিরোধী দলকে দায়ী করেই তাদের দায়িত্ব শেষ করছে। আর তাদের ধামাধরা বুদ্ধিজীবীকুলও সেই সুরে তারস্বরে চেঁচিয়ে যাচ্ছে।

শুরুতেই প্রশ্ন তুলেছিলাম, এভাবে র‍্যাব বা চিতা দিয়ে কথিত সন্ত্রাসী খুন করিয়ে দেশ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল আদৌ সম্ভব হচ্ছে কি না? নিবন্ধের শেষে এসে এ কথাই বলতে চাইছি যে, এর ফলে সন্ত্রাসের 'স'-ও নির্মূল করা যাচ্ছে না, বরং সরকার নিজের জন্যই কবর খুঁড়ছে এই ভাবে ঢালাও হত্যার নির্দেশ দিয়ে। যে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সরকার ক্ষমতায় বসেই তৈরি করেছে এবং এখনও পর্যন্ত যাদের শেল্টার দিয়ে চলেছে তাদের বিনা বিচারে হত্যা করে সন্ত্রাস নির্মূল করার স্বপ্ন, দিবাস্বপ্নই। এভাবে হয়ত আপাতদৃষ্টিতে কিছু জ্ঞানপাপীর প্রশংসা কুড়ানো যাবে কিন্তু প্রকৃত সন্ত্রাসীদের মনে ভীতি সৃষ্টি করে তাদের দমানো যাবে না। আর সন্ত্রাসীরা তো তাদের নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছে যে, সরকার রাষ্ট্রীয় খুনীদের সর্বতোভাবে আশ্রয়প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। ছিঁচকে চোরকে মৃত্যুদণ্ড আর রাষ্ট্রপিতা ও জাতীয় নেতাদের হত্যাকারীদের ফাইভস্টার ট্রিটমেন্ট– এই পার্থক্য যতদিন সরকার বজায় রাখবে ততদিন দেশ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল যে সম্ভব নয়, সেটা সরকার নিজে জানে ও বোঝে।